শেষের কবিতা

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামন্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল-- অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিঁকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ.'র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্স্‌ফোর্ডে ভর্তি হয় ; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্স্‌ফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা "বিষবৃক্ষে", বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন ; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে", নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস্তুর বলে জানত। অক্স্‌ফোর্ডের বি. এ.'র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে-- সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তন্তে"। nd

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না-- বলত, "রেখে দাও তোমার অক্স্‌ফোর্ডের পাস।" সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম. এ. ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, "অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি!

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা ; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক্‌ পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো ; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না ; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা ; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি ; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে ; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে-- কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্‌। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে ; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি-- ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু

খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে ; উচ্চৈঃস্বরে বলে ; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি ; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি ; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্‌ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায় ; অথচ সবাই জানে, ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে ; দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ও পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, "গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।"

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল ; কিন্তু সে জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, "অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।"

অমিত হেসে উঠে বললে, "তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি-- বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে ; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।"

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, "তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।"

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন ?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।"

অমিত বলে, "আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন ? বলে, তার কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম. এ.-তে বটানিতে ফার্স্ট্। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।"

অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত বললে, "পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন ? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে-- ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে ; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্-একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল ; ও বলে উঠল, "বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে ; খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে
গেল-- কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারো গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।"

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস করে বললে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, "মানে কী হল।"

অমিত বললে, "যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না ; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।"

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল ; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলেগোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, "কবিমাত্রের উচিত পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, 'আনো ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্স্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্তে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে

মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্য দিন-- ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভ লগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পূজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।... ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্নে করলে, "সাহিত্যে থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান ?"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো-- গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা-- তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মন-ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে-- অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্‌ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রণের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ ; ডিকেন্‌স্‌কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্‌বুদ্‌ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।"

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, "ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো।"

অমিত বললে, "ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।... যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা

করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে বূ্যহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসীভর্স্ অফ স্টোল্‌ন্ প্রপার্টি। সে স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া-- শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।"

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, "জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।"

অমিত ফস্ করে বললে, "নিবারণ চক্রবর্তী।"

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল-- "নিবারণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে।"

"আজকের দিনে এই-যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।"

"ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।"

"তবে শুনুন।" বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল--

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।

শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্থ ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে,
তরঙ্গের নিষ্ফলতা

নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট-'পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা।
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ।
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।

ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি,
"ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারি,
তোর কণ্ঠধ্বনি
ঘুরি ঘুরি
নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।"

অস্ত্র আনো।
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে,
মুহূর্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্ধ্বস্বরে চাহিব খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ--
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,

অপরিচিতের পরিচয়--
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণসঞ্চয়

ছিন্ন ক'রে মুক্ত করে সর্বজগন্ময়।।

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে বললে, "একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষকে বোকা বানাবার জন্যে।"

অমিত বললে, "অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্তে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।"

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, "আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?"

অমিত বললে, "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোট-বইয়ে লেখা আছে।"

"কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।"

"আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।"

সিসি বললে, "অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।"

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্র্যাক্‌টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।"

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চার দিক চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে-- দুদিন না যেতেই বুঝলে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সেই বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না ; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো-- ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ, ওর মধ্যে বিস্তর আছে কিন্তু এক নেই-- তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন, শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। ঝরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে, পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে ; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়-- নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলাণ্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না-- মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খাদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত-- তার মধ্যে "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে-- আর, চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে "দেহলীদত্তপুষ্পা" যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মানবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো-একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে-- পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি-- চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দরপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে-- মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, "অপরাধ করেছি।"

মেয়েটি হেসে বললে, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।"

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প-বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট-বইখানা খুলে লিখলে, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে-- নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপ জলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, "একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।"

অমিত বললে, "উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে-- একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীর্তি।"

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, "লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।"

অমিত বললে, "আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।"

"দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।"

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, "আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই-- বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়-- এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।"

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন্‌ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে ; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্‌ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে মেমে বললে, "কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।"

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, 'আমার সময়ের অভাব নেই, এখনই আসতে পারি।' সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল, "পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে-- লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে ; এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনেয় বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না ; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, 'কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমার 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও!' বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল--

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,

আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য ;
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

৩

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানতাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক-দৌড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল ; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ণ যায় কেটে ; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফ্লেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায়, শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক-কলেজে পড়া, একই হোটেলে চপকাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা-নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত, প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু

বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন-- এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, "মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি। দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে দুঃখ বোধ করি না। তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।"

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন ; এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল। তিনি যোগমায়াকে বলতেন, "মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্‌কার থেকে বাঁচিয়েছ।" এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের-কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে "বাধ্যতামূলক"। স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে ; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

৪

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি, এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্য তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত-ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে-- খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে-- বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর-একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারো দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যের ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেন্‌সিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাঁটরার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার-দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে। টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায় ?

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফ্‌লেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি. এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির ’পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন-একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম. এ. পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত-- তার বদলে আপন পরীক্ষা-পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ। সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্ন রিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে-- অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী ?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে ; কারণ, শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার ’পরেই রাগ ধরল-- নিজের উপরে, ননীগোপালের ’পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনই তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন, বললেন, "পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।"

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা-কোনো কথা বলে ; জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ ; যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্‌ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে-পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্‌-এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না। বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ এক সময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, "আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন ?"

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

"আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন ? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই ?"

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।"

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে ; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসার অবসর যদি কোনো-একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটালো। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত

টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, "আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ।"

লাবণ্য বললে, "আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা! যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।"

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড্‌ শ'র আমল পর্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট্‌ মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল ; আর সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে "জাগো"। লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে-- জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারি দিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে, ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে ; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন-টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন'-এর কাব্যসংগ্রহ। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্‌স্‌ট্‌ বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে ; এখানে বস্তুর ভার কম ; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে ; প্রতি মুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে ; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে ; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, 'আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব।'

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা ; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন করে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম-পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, "তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।"

অমিত বললে, "আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছেন ?"

অমিত বললে, "ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।"

"মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা।"

"ভেবে দেখুন-না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না ; বলতেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন ছেলেমানুষি।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।"

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি-- গাড়ি-ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন-- এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "কর্মফল কার বাবা। তোমার না আমার, না যারা মোটর-মেরামতের ব্যবসা করে তাদের ?"

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, "শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের ; নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে ?"

যোগমায়া লাবণ্যর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ করেই বললেন, "বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।"

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, "মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো ? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।"

লাবণ্য বললে, "আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।"

"ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।"

লাবণ্য হেসে বললে, "ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।"

আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। ছনরতঢ়ভৎভঢ় ষপ গতলনড় প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।"

"আপনি সাবেহি কায়দা ভালোবাসেন ? মিস্টার রয় ?"

"একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।"

"দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।"

"বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।"

লাবণ্য বললে, "সহজ নয়, সময় লাগবে।"

"সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই ; ট্যাঁকঘড়ি আছে, ট্যাঁক অনুসারে তার চাল। আইন্‌স্টাইনের এই মত।"

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

"ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।"

"সময় আর নেই, কাজ আছে" বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে শিখেছে, কিন্তু পায় নি-- লাবণ্যর মুখে ও এমন-একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস। গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয় ; তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে ; এক কথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলং পাহাড়টা চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই ; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে--আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্যাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধ-ঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক, এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ম, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘন্টা এবং বিকেলে দু ঘন্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য-- এত বাহুল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকলাবেলাকার অনেকগুলো ঘন্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে-- তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে ; কিন্তু সময় চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে, বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়তে দৌড়তে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, “জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়।”

“কিসের অসুবিধা।”

অমিত বললে, “যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে। দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।”

“না ডাকলেই চুকে যায়।”

“বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।”

“কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।”

“মিস ডাট ? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন-না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্তের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে। মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না। কল্পনা করুন-না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট।”

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, “নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।”

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, “চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো। এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না-- সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।”

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন ?”

অমিত বললে, "জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন-কি, তারা গানও গায়।"

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, "আশ্চর্য !"

অমিত বললে, "হাসছেন ! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।"

লাবণ্য বললে, "আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।"

অমিত বললে, "দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে।"

"এর জবাবে খুব-একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো, ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস নতুন করে আবিষ্কার।"

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, "আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেছি, আপনি যে কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার, আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না। এক এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে ; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন-না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।"

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, "বের করতে পেরেছেন ?"

"হাঁ, পেরেছি।"

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, "লাইনটা কী বলুন-না।"

"For God's sake, hold your tongue
and let me love !"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।"

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, হাঁ।

অমিত বললে, "সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডনের বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ

লাইন আমার মাথায় আসত না।"

"আবিষ্কার করলেন ?"

"আবিষ্কার নয় তো কী। বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে ; আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডনের কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়, বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডনের কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি--

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।"

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি।"

"ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব-বা। নতুন অমিত রায় কী-যে কাণ্ড করে বসবে, পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো-বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।"

"লড়াই ? কার সঙ্গে।"

"সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্‌খুনি চোখ বুঝে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।"

"সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে, ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেশি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব 'যুদ্ধং দেহি'-- ঐ যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।"

লাবণ্য হেসে বললে, "লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায় ?"

"তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব, এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।-- বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে ভাবনা নেই।"

অমিত বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?"

"কী, বলুন।"

"আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।"

"আচ্ছা, বেশ, তার পরে ?"

"ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাতলা পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝির্‌ঝির্ করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।"

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু সময় যে অল্প।"

"জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্যদেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল। যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্ক্‌চুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্ক্‌চুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে 'ভবে এসে করলে কী' তখন কোন্ লজ্জায় বলব, 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।' তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।"

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারো যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, "চলুন।"

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না, স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, "দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা-- একটা সাধু, আর-একটা চলতি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল-- সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা এইরকম জায়গার জন্য। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাবণ্যদেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?"

লাবণ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, "চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।"

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, "রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।"

"হাঁ, লাগে।"

"আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে; তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।"

"আপনি এত ভয় করছেন কেন।"

"এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।"

"আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।"

"এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক--

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?

বিষয়টা দেখছেন ? না-চেনার বন্ধন। সব চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে।

নিজেকেই ভুলে থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না--
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী--
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিন্ন হবে ডোর--
তোর মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ

শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।"-- লাবণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে--

"হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।"

আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭
ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, "মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।"

"পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম-ধাম-বিবরণটা বলো।"

অমিত বললে, "নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।"

"তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।"

"অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রী ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।"

"আচ্ছা, নামটা নাহয় খাটো হল, রূপটা?"

"বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।"

"অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?"

"পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ করা চাই-- নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।"

"আচ্ছা নামরূপ থাক্, বাকিটা?"

"বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।"

"বুদ্ধি?"

"লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।"

"বিদ্যে?"

"স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।"

"পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।"

"অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।"

"তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।"

"জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা। ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা?"

"সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।"

"এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।"

"বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।"

"মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে কথা বুঝেছিলেন।"

"আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে।"

"কিরকম পরীক্ষা চান, বলুন।"

"একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।"

"কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।"

"যে রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।"

"মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে, যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা--জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনই ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।"

"ভয় নেই বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও, হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব, লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।"

"আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।"

"আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে।"

"দেখছি, বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।"

"তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।"

"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ণ। নইলে আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন।"

"বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।"

"মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।"

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল, আজ তাকে অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, "অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।"

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, "পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন।"

"কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব--"

"ইস্কুলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।"

হঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, "কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে।

সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।”

“সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম।”

“বলেছিলে, ‘অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।’ বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ করি নি।”

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, “কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এ উপদেশের বাজারদর বেশি, আক্‌ব্বরি মোহরের মতো ; কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।”

“তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।”

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, “জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।”

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, এক ধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলার রোদ্‌দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে, “সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।”

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, “যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।”

“তা দাও।”

“তোমাকে ডাকব বন্য বলে।”

“বন্য !”

“না না, এ নামটাতে হয়তো-বা তোমার বদনাম হল। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব-- বন্যা। কী বল।”

“তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।”

"কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আমারও ঐ রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি 'ব্রহ্মপুত্র' কেমন হয়। বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।"

"নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারী।"

"ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।"

"আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।"

"চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে-- বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে নাহয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী।"

"ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।"

"সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা!"

"কী মিতা।"

"তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?-- অনন্যা!"

"তাতে কী বোঝাবে।"

"বোঝাবে, তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।"

"সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।"

"বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো, পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব--

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

"তুমি কবিতা লিখবে নাকি।"

"নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

"এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।"

"কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয় তেমনি করেই, কেবলই অক্স্‌ফোর্ড্ বুক অফ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।"

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, "হাত জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব চেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।"

"কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা!"

"কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের

আগুনে ; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে। তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই টিঁকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো--

"For God’s sake, hold your tongue
and let me love!’’

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, “ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপ্‌টস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি-চাটগাঁ পর্যন্ত চীৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্‌সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে, হয়তো এইটেই ভালো।”

“কোন্‌টা ভালো।”

“ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়িতে নাড়িতে।-- আচ্ছা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।”

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, “তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।”

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, “তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।”

“ভয় কিসের।”

“তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই-বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।”

“কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।”

“তুমি যখন বললে কর্তা-মা সম্মতি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।”

“ধরাই তো পড়তে হবে।”

“মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন

আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না-- না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।"

"বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ।"

"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফেরো ; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা ? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভাল্‌গার। ওটা বড়ো রেস্‌পেক্‌টেবল্‌ ; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।"

"বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।"

"মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না, তাতেই আমি খুশি থাকব।"

"বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।"

"আজ তুমি তার কোন্‌টা।"

"যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে রুচির ঢাকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ।"

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।"

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে

আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।"

অমিত বললে, "তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।"

"আমি চাই নে কবি হতে।"

"কেন চাও না।"

"জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।"

"বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি ; ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা-- কী করে খবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে--

"ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা--
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।

"আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই-- তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

"আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি--
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী।

"তুমি ঝরনা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

"আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে

মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।"

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, "যতই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।"

অমিত বললে, "কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর কিছু যদি না থাকে, আমার বাণীরূপ রয়েছে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "কোথায়। নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায় ?"

"আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।"

"তা হলে কোনো-একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।"

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে-- খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, 'লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়-- কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়-- জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব। এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ। পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল। এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব ক'রে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।'

এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?"

"ঠিক বুঝেছি মা।"

"অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।"

লাবণ্য একটু হেসে বললে, "ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।"

"সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।"

"সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে।"

"দেখছ-না লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"তা বাসেন।"

"তবে আর ভাবনা কিসের।"

"কর্তা-মা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।"

"আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।"

"কর্তা-মা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।"

"তা মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ, যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।"

"সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন্তু, যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানা-হেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর-কি।"

"তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য।"

"বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তা-মা, খুঁৎখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে

স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে-- মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো-একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।"

"লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু, উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

"তোমার মনে হয় অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না ?"

"স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন। আমি তো তা চাই না।"

"তুমি কী চাও।"

"যতদিন পারি, নাহয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন। সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাহয় সে গুটি-থেকে-বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী-- জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়-- নাহয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী। কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।"

"সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে নাহয় ক্ষণকালের মায়া-রূপেই থাকবে। আর নিজে ? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না। তোমার কাছে অমিতও কি মায়া।" লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, "তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি, তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে ; তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে ; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে-- দেখলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি ; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।"

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, "তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে ; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ

যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।"

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে-- এও তো সূক্ষ্ম।যোগমায়ার মা-ঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, "কর্তা-মা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।"

যোগমায়া বললেন, "আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।"

"না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো-- কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয়, এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে বোলো না, কর্তা-মা।"

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

৯

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মায় যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্‌ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জালনা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্‌ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, "বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে।"

অমিত উত্তর করলে, "উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্‌বাবের তপস্যা-- খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা-- এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।"

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো-- থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প-কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বার বার বললেন, "মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।"

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো-একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, "এ কী কাণ্ড অমিত।"

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।"

"অসম্বদ্ধ প্রলাপ ?"

"অর্থাৎ, বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে তবে সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রোটেস্ট্ স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি-- ঘরের মিস্‌গভর্মেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্‌সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।"

"মূলনীতিটা কী শুনি।"

"সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন তেমন ব্যবস্থাও ভালো।"

আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। 'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি ! আর, যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন। পোড়ারমুখিকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।'

একবার যোগমায়া ভাবলেন অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তারপরে কী ভেবে বললেন, "একটু বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি।"

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল, লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গৌর্কির 'মা' বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল।

বললেন, "চলো একটু বেড়িয়ে আসবে।"

সে বললে, "কর্তা-মা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, যার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল, কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে, এল বুঝি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছট্‌ফট্ করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল-- যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হূহূ করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা-- অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল ! এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ-রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে

আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে-- শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপার-গামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে। সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি-- আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল-- সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন্‌টন্‌ করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে-- নিবিড় একটা নৈরাশ্যে ; মনে হল, ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্‌ করে জ্ব'লে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে-একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, "সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, "এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা।"

"যদি না ভালোবাস, ওকে স্পষ্ট করেই বল-না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

"এইমাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে। ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না।"

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, "আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা ? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব। আর কেউ কি এমন করে জেনেছে।"

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল। তাকে আস্তে আস্তে বললেন, "মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে -- সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও, একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।"

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক ভাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো-- সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে ; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে ; তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “এ কী অন্যায় মাসিমা।”

“কেন বাবা, কী করেছি।”

“আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন।”

“শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন।”

“শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।”

“এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা।”

“নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্য-দেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।”

“দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত ; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।”

“এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্‌ড্‌ কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই, লাইফ্‌স্‌ কমেন্টারি ইন্‌ ভার্স্‌। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছি, সে লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়--

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস নে তারে ;
সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়।

দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধূলায় পথের ধারে।

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো ? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্যধনে
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের-- নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটিরের নাম দেব মাসতুতো বাংলা।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটিরেও তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ ? মনে মনে নিশ্চয় জান পেয়েছ।"

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, "তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।"

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, "তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।"

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুইজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। এক সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন।"

অমিত উত্তর দিলে, "কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে, আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ। সে অকূল কোনোকালে কি পার হব।

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন--
ডুবুক সবই, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে ?"

"হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।"

"বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে-না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে
উঠল-- তারই উপরে আলো ঝল্‌মল্‌ করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর। এই-যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি ; একে থামায় কে।"

"মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে।"

"মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম-- কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও !

O, what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.

একি রহস্য, একি আনন্দরাশি !
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম--

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন-- হয়তো-বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।"

"বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মন্‌সুন নেমেছে। ওয়েদার-রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে, এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, "মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।"

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, "বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।"

লাবণ্য বললে, "কী দরকার মিতা।"

"তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা! ভালোবাসার যত-কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো। সে কথাটি শুধু এই, 'পেয়েছি।' আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক-না।"

লাবণ্য বললে, "আচ্ছা, তাই থাক্‌।"

"কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্‌ পাথর তুমি ভালোবাস।"

"আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।"

"আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।"

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল, আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, "তোমার কলকাতায় ফেরবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"এমন কড়া শাসন কেন।"

"সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।"

"এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ, এই ভরা দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চমকে থেমে-যাওয়া লাইনটা--

চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে !

শিলঙ থেকে আমিই নাহয় চললুম, কিন্তু পাঁজি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস্‌ করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী করব জান।"

"কী করবে।"

"মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায়, দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অজ-মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন।"

লাবণ্য বললে, "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অমিত বললে, "সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।"

"মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।"

"আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামী জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা, শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।"

"দামের হিসাবটা শুনি।"

"রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ডহার্বারের ঐ দিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ্‌ করে ঘন্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।"

"আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল।"

"এখন কোনো দরকার নেই, সে কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে, ব্যবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে, কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে--জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয় ; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো ? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।"

"বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে হবে--দশটা-পাঁচটা।"

"দোষ কী। কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।"

"কিসের কাজ, বলো। বিনা মাইনেয় ?"

"না না বিনা মাইনের কাজ কাজও নয়, ছুটিও নয়, বারো-আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।"

"আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর ?"

"স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি--গঙ্গার ধার ; পাড়ির নীচে-তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি-পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকা বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ-ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু বসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে-সাদায় রঙকরা আমাদের ছিপ্‌ছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম, বলে দাও তুমি।

"বলব ? মিতালি ?"

"ঠিক নামটি হয়েছে--মিতালি। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল। বাগানের মাঝখানে দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।"

"রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব।"

"দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী ; আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।"

"দীপক।"

"ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব। মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই--সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।"

"আর তোমার বাড়িতে আমি ?"

"ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।"

"নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে

বরঞ্চ আমি বুর্‌কা পরে যাব।"

"তা হোক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।"

"আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ ? আমি একঘরে ?"

"তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে--চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

"এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।"

"আচ্ছা বেশ।" পকেট থেকে একটা নোট-বই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে--

"Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.
চুমিয়া যেও তুমি
আমার বনভূমি
দখিন-সাগরের সমীরণ,
যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।"

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, "এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি, তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।"

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, "না, আমার এই নোট-বইয়ে লেখো।"

লাবণ্য লিখে দিলে--

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্‌।"

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, "আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি, শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।"

লাবণ্য বললে, "নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে ?"

অমিত বললে, "সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝির্‌ঝির্‌ করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির-দাঁতে-কাজ-করা

খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পুজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দুজনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে, আমি যাব সমুদ্রে।--এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত।"

"মেনে নিতে রাজি আছি।"

"মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে বন্যা।"

"তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।"

"প্রয়োজন নেই তোমার ?"

"না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে ; সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।"

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে দূরে ভেদ নেই। সাড়ে-তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পুব-দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আমলারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সার্‌কুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আল্‌নার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দু হাত তফাতে নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে--

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ-হাওয়া
প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা।"

"কিচ্ছু না মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে।"

"আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েদিলুম। ইকনমিসক্‌সে এম. এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না-সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিনে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।"

তোমারও ছাতে দক্ষিনে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে।"

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, "থাকবে, থাকবে থাকবে।"

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী থাকবে অমিত। আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।”

“জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায়, সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।”

“একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।”

“একদিন সময় আসবে, দেখাব।”

“বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।”

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, "কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।

"আত্মীয়স্বজনেরা কি জানে, কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব।"

"খুব জানে। নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের। তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল। এ যে যুগ-বদল ! তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।"

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে ; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্তজগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "চলো এবার।" কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিল সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, "কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে। তার আগে আর দেখা করতে আসব না।"

"কেন আসবে না।"

"আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল--ইতি প্রমথঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে-বয়ে স্বর্গ।"

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরম ক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে। রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই প্রণামটি করে ; বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, "বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা-কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।"

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে--

“তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব-হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।”

“বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল। তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।”

“ভয় কিসের মিতা। এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না--এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে।”

“কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়।”

“রবি ঠাকুরের।”

“তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।”

“বইয়ে বেরোয় নি।”

“তবে পেলে কী করে।”

“একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত। বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।”

“আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।”

“সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।”

“তাকে দয়া করেছ ?”

“করবার অবকাশ হল না। মনে মনে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।”

“যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি, এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।”

“হাঁ, তারই কথা বইকি।”

“তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল।”

“কেমন করে বলব। ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে--

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ-বন্ধ টুটে।
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া

বিচ্ছেদশতদল।”

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, “বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল। ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়। কিন্তু কেমন একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।”

“একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতাদুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে হল।”

“সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই।”

“কেমন করে বলব। কিন্তু এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।”

“বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো-লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।”

“দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।”

“তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।”

“আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।”

“রাগ কোরো না বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।”

“রাগ করবো কেন।”

“আমি একটি লেখককে আবিস্কার করেছি, তার স্টাইল--”

“তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি, তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্য।”

“সর্বনাশ ! তার বই ! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো--”

“ভয় কোরো না মিতা, তুমি তাকে যেভাবে বোঝ আমিও তাকে সেইভাবেই বুঝে নেব, এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।”

“কেন।”

“আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেল্‌ফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।”

"আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড্‌ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।"

"কিচ্ছু খারাপ হয় নি, হওয়া ঠিক আছে।"

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল--

'সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত-পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া! গ্র্যাণ্ড!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড্‌ডো বেশি ; যে নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে--

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ। ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ও পারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল--

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা

জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে--

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।"

"রাগ কর কেন মিতা। রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বারবার বলে লাভ কী।"

"তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি--"

"ও কথা বোলো না মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারো সঙ্গে আমার মিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ। নাহয় কথা রইল, তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।"

"কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো বিবাহ।"

"রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।"

"ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলার সুর বিগড়ে গেল।"

"একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।"

"আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুল্‌ডগের মতো-- ধুতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।"

"তা মানতেই হবে। পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে

তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না, অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক্ গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা--বিনা তর্জমায়।"

"না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারো নয়।"

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, "জয় নিবারণ চক্রবর্তীর ! এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।"

"তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে।"

"না থাক তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।"

"আচ্ছা, কান-মলার কথা পরে স্থির করব ; এখন শুনিয়ে দাও।"

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল--

"কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।
এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণপরিণাম।
এ প্রণতি'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে,
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।"

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না, সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা ; কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায়, গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এখন সময়, বেলা তখন ন'টা, অমিত দুম্‌দাম-শব্দে ঘরে ঢুকেই "মাসিমা" মাসিমা" করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডানেন নি ; বুঝেছিলেন, আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, "কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি।"

"ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি ; গাড়ি ঠিক ; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কি না। সেখানে এক টেলিগ্রাম।"

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর সব ভালো তো ?"

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, "আজই সন্ধেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।"

"তা ভাবনা কিসের বাছা। শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না।"

"সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।"

"আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খেপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরই।"

"না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট্। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির

খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।"

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই-যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝলে, যে-বাসা এতদিন দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, "আমি হোটেলেই যাই আর জাহান্নমেই যাই, কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।"

অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্‌বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল। লাবণ্যও ভাবলে, অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি সময় আছে। বেড়াতে যাবে ?"

লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, "না, সময় নেই।"

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, "যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।"

লাবণ্য বললে, "কর্তা-মা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম, আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।" বলে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, "আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।"

এই বলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, "বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক। নিশ্চয় ভেবেছে, ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকব। দাম বেশ-একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকানো থাকবে।"

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, "আর-কারো কথা অত করে তুমি ভাব কেন। নাহয় আর-সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, "বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ, সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে, ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি ; সেটা হচ্ছে ত্যাগের।"

"বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি তৈরি-জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি-ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো ; সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ঐ ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই। ওরা কি একজন মাত্র। সেইজন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটি কবিতা লিখেছে--সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেখা--

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেব, দরজা খুলবে না।"

"মিনতি রাখো মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী। কিন্তু তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের

ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু কোরো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা কোরো।"

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্‌-একটা উদ্‌বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, "তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল-পরিদর্শন। ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।"

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, "দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।" এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়। দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধরলে। জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখলে, ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের 'বলাকা'। তার নীচের পাতাটা ভিজে গেছে। একবার ভাবলে, ফিরিয়ে নিয়ে আসি গে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না ; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা ; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘননীল আকাশে খুদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছল্‌ছলিয়ে। কাছে এসে বললে, "মিতা, তুমি কি ভাবছ।"

"এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।"

"মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তা তোমার উলটো ভাবনাটা কিরকম শুনি।"

"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম--কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি--অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার-ফলা-ওয়ালা লম্বা লাঠি, পিছে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বন্ধ ঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।"

"ডায়মণ্ড্‌হার্বারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর-বেচারাও গেল। তা যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কিরকম করবে। দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে আর আমি আর-একটাতে ?"

"তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরানো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।"

"হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা।"

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়-- রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, "শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছা করে।"

"এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান ?"

"কী, বলো।"

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত-দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল। নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম, ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয়-মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, "জান বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।"

"কেমন করে।"

"আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল, তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধূ, ঘরে এসো। তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন

হবে।”

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, “মিতা, আর নয়, সময় নেই।”

১৪

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙ-সুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্মেন্ট্ আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয়--তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট্ ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্জে--অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো! সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখে নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায়-ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা মোটা চুরুট থাকে, এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত, চুরিবিদ্যের মতোই। তার সার্থকতার প্রমাণ হয়, যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে, "অমিত রায়ের অমিতাচার"। মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতিবিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুটধূমাকৃত অত্যুক্তি-উদ্‌গারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতি-সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে-পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্ত অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন-কি, তারযোগে অত্যন্ত বে-তার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি--কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে

উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ, কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জামিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও ; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট্ বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়, এই জন্যে আর্ট্-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কন্টকিত করেছে, এ দিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামী হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো--এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালায় রেজিস্ট্রি-বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা, কর্পুরতলার নাম-পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত ; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা-- বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স্। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ ; এখন মনে হয়, সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষই করে না, যদি-বা লক্ষ করে তাতে যেন আধ খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল এখন বারবার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুর্‌ফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত ; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলের, কখনো চৌকির

হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ-খুর-ওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায় ; যেন ছাগল-জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পয় নি, কিন্তু ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগ্‌টগ্‌ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা-- এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে হয়ে গেছে অতীত যুগ ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে ; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা ; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল ; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না ; ক্রিস্ট্‌মাসের প্লাম্‌ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে, এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালির কাছে সে নাচ শিখছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার "স্পেশাল ক্রিয়েশন"। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাকে মেয়েদের সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝক্‌ঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়। এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, "দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার

দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইন গাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিং নয়।"

অমিত ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক্‌ নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন "mute insensate things"।

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক্‌ নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল, লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়ো হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, "খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি।" খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সুখীযুগলের কাছে বলে, 'চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।" কিন্তু প্রপাতটা কোন্‌ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্‌-অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেছে। মেয়েদুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়ল, বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টক্ টক্ করে উপরে উঠে উংরেজিতে বললে, "দুঃখিত।"

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে "কাকে চান আপনারা।"

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, "মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।"

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। বললে, "তাঁকে তো আমরা চিনি নে।"

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়-হাসির রেখা। কেটি ঝাঁজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him" .

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "কর্তা-মাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।"

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার টীচার ?"

"হাঁ।"

"নাম বুঝি লাবণ্য ?"

"হাঁ।"

"গট ম্যাচেস ?"

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, "দেশালাই।"

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ইংরেজি পড় ?"

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, "গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক, ম্যানার্স শেখে নি।"

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। 'ফেমাস লাবণ্য! ডিল্লীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্‌ক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার। সিলি! মেন আর ফানি।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ

অদ্ভুত-ধরনে-কাপড়-পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া। কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে।

"সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্-এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।"

এই বলে টেবিলে অ্যাল্‌জেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেন্‌সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের 'পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে!

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য হল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া-চুলে-দুই-চোখ-আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি-নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, "নটি ডগ্।"

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড় ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, "আমি সিসি, অমির বোন।"

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, "অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা।"

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, "এসো মা, ঘরে বসবে এসো।"

সিসি বললে, "সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।"

যোগমায়া বললেন, "এখনো আসে নি।"

"কখন আসবেন জানেন?"

"ঠিক বলতে পারি নে--আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।"

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, "যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালে জানেই না।"

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন, কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন, এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, "শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের

হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।”

কেটি বেশ-একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, ‘লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।’

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই ; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত--একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে। যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের। সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখ-চোরা আপত্তি লুকিয়েছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুমি মারতে প্রস্তুত--that much for it!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল, মাথায় ছিল ফেল্ট্ হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ্, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে বিকেলে সাড়ে-চারটে বেলায় চা-পান-সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে--একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে

রেখেছ--সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্ক্‌চুয়ালিটি ; কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে।

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে, যেমন বহুদিনের জ্বোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটর মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দায় যে কোণটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল, নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার ; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্তেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা ; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল ; সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্‌ভাবপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করে "মাসি" বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "মাসিমা, লাবণ্য কোথায়।"

"কী জানি বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।"

"এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।"

"বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।"

"চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।" যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল, "অপমান ! চলো কেটি, ঘরে যাই।"

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, "কোনো ফল হবে না।"

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; বললে, "হতেই হবে ফল।"

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, "চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, "এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।"

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে

একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন্ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, "মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।"

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁস্‌ফোঁসানিতে যুদ্ধের আশু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্রগর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে আর দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, "আই কন্‌গ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে। রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।"

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে, কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বলেল, "আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ। আমি বলেছিলুম, বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ ; আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।"

কেটি শান্ত স্বরেই বললে, "কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।"

"কী করতে হবে বলো।"

"নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যান্‌রা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো-না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায় ইংরেজিতে যাকে বলে ংভরধ ফষষড়ন।"

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, "মনে পড়ছে সেই গল্পটা--একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোনো পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসে ছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়। মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না

আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, "অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু ; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস্ করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সান্ডে স্কুলের বিধানমত ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন--এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে ? দেখো তো সিসি, কী অন্যায়।"

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি-কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বলল, "অমিট তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।"

সিসি বললে, "বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই।"

"মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল--এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে, অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা, এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে, সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন। সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না। এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।"

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে। তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিলড্ড

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল "মন্ আমী", ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে 'বঁধু' !

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না কী বলবে।

কেটি বললে, "বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।"

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেলা-করা মুখের উপর দিয়ে দর্ দর্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা :

> শিলঙে কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্‌কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল। সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্‌ অমৃতে বেঁচে রইল। আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে :

> তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি ; আজও, তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, “বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।”

অমিত ভয়ে ভয়েই বলেছিল ; ভেবেছিল, লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, “চলো।”

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না! চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, “একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে আজ সে

আংটি খোলালে কেন।”

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, “তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে বন্যা। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ।”

লাবণ্য বললে, “তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।”

অমিত বললে, “কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।”

“কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন। সে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি, ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো ; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক্ গে ও সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।”

“বলো, নিশ্চয় রাখব।”

“অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেরিয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার, ওকে আমোদ দিতে পারবে।”

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, “আচ্ছা।”

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, “একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন ; বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।”

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি উদ্‌ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই য়ুক্যালিপ্‌টাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, “ঘর খুলে দেব কি। ভিতরে বসবেন ?” অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, “হাঁ।”

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্‌ফ্ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা ; দু-চারটে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেন্‌সিল টেবিলের

উপরে। পেন্‌সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন-কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন শুনতে পেলে শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান--বাছা ! সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৭

শেষের কবিতা

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে, অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড্‌ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে ; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে "কেয়া" বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের "নিরুদ্দেশ যাত্রা।" কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না। যতি বুঝতে পারে, আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অমিতদা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে ?"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে।"

"না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।"

"খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।"

যতি হেসে বললে, "এর মধ্যে ভুল বোঝার জায়গা কোথায়। বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।"

"দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায়, সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।"

যতি বললে, "অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।"

"আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে--মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয় ; মানুষকে বাদ দিয়ে

তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।”

“তোমার বিশেষ মানেটাই বলো-না।”

“সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা তা হলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব। ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।”

“তা হলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব, আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ চলে না।”

“ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি। উপায় কী। তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক, চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।”

“তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে।”

“এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খমত করতে দোষ নেই।”

“ধরে নাও-না প্রাণের গরজেই।”

“শাবাশ, তবে শোনো।”

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্‌ণে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বলে, “অক্সিজেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-এর ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার--দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ ?”

“সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।”

“যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।”

“তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।”

অমিত বললে, “একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।”

“কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না।”

“জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো ; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।”

“কিন্তু--”

"কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স্ সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি। কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স্ আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স্, আমার মর্তেও ঘটাব রোম্যান্স্। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল; আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব, সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাবণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।"

যতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, "দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না-হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়--কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল--প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না।"

"যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি--"

"তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

"তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?"

"দেব।"

অমিতর এই চিঠি:

সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে--অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।
মিতা।

তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে উইলিয়ম জেম্‌সের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে। অপর পাতে :

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেরি তার জাল--
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয়, অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়--
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,

সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো--কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই--
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।

উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান--
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

ব্যালাব্রুয়ি, বাঙ্গালোর
২৫ জুন ১৯২৮